International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)
Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 68-80
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বরাক উপত্যকার পীর-ফকির : সমাজ, সাহিত্য ও সাধন (একটি বিশেষ পাঠ)

সামস উদ্দিন বড়ভূইয়া
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, কাছাড়, আসাম, ভারত

Abstract

Pir, Fakir, Sufi, religious poets give pleasure to the people for their whole life. It is observed that Lalan Fakir, Hasanaraja, Akrum Shah, Durbin Shah, Abdul Karim, Saiful Mia etc. pleased the people throughout their life. Till today people enjoy and follow their way of living. The religion song of those mediators are still heard in every corner off the villages, towns etc. The living religion songs of Pir Fakir in Barak valley are also melodious and the people enjoy them. When we speak about the Pir Fakir of Barak Valley, firstly, the name of saha Jalal comes. He came in this valley with some of his followers and started their livelihood here. They should their karamati and attracted the people. After which, many other religions scholars from abroad and other part of this county came to this area to teach to and show the way to the people how to live in a simple way so that one can attain the pleasure of Almighty.

পীর-ফকির এই শব্দ বন্ধটির দ্বারা আমরা সেইসব মানুষদের বোঝে থাকি যাঁরা সমাজকে ভক্তি ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে থাকেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানারূপে, নানাভাবে এঁদের অবস্থান লক্ষ করা যায়। মুসলমান সমাজে যাঁরা এই ভূমিকা পালন করে থাকেন তাঁদেরকেই বিশেষত পীর-ফকির বলে চিহ্নিত করা হয়। যদিও অন্য ধর্ম, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও এঁদের গ্রহণ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। এঁরা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দীক্ষা গুরুর দায়িত্বভার পালন করে থাকেন। এঁরা সবাই সমকক্ষ বা সমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হন না। এঁদের মধ্যে অনেকেই যেমন ধর্মের শাস্ত্রীয় শিক্ষায় সুপণ্ডিত হয়ে থাকেন তেমনি আবার অনেকের প্রথাগত ভাবে তেমন কোনো শিক্ষা থাকে না। সে যাই হোক তাঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য নিয়ে যাওয়ার জন্যই প্রচেষ্টা ও তপস্যা করেন। লক্ষ্যে পৌঁছানোর অর্থাৎ স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির মিলন সাধনের তাদের এই প্রয়াস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কর্ম পদ্ধতিতে এই ভিন্নতার দিকে লক্ষ রেখে তাঁদেরকে পীর, ফকির, দরবেশ, বাউল, আউলিয়া, সাধক, মরমিয়া প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়। তবে আমরা নানা দিক বিবেচনা করে পীর-ফকির এই শব্দবন্ধটির মাধ্যমেই এঁরা সবাইকে নির্দেশ করছি।

পীর-ফকিরগণ যেমন একশ ভাগ শরিয়তপন্থি হন না তেমনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখেন না। ধর্মের শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে অক্ষুন্ন রেখে নতুন নতুন আচার অনুষ্ঠানের সংযোজন যেমন করে থাকেন তেমনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেও নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে পারেন। তাঁদের প্রভাব জনজীবনের সর্বত্রই বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের প্রভাবে যেমন বাঙালি হিন্দু সমাজ নবরূপ লাভ করেছিল তেমনি হজরত

শাহজালালের প্রভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ বলিষ্ঠ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্ম, সমাজনীতি রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও সংস্কার সবকিছুতেই পীর-ফকিরদের জোরদার উপস্থিতি ধরা পরে।

আমাদের বরাক উপত্যকায় পীর-ফকিরদের অসংখ্য আস্তানা রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ পীর-ফকিরই মৃত অবস্থায় শায়িত আছেন। বরাক উপত্যকার পীর-ফকিরদের আদি উৎস হজরত শাহজালাল। তিনি বাংলাদেশের সিলেট শহরে শায়িত থাকলেও বর্তমান বরাক উপত্যকা ও সিলেট বিভাগ অতীতে সুরমা উপত্যকা নামেই পরিচিত ছিল। তাই শাহজালাল এর প্রভাব এখানকার মাটিতে চড়িয়ে পড়তে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। শাহজালাল এর সঙ্গে ছিলেন ৩৬০ জন অনুচর। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বর্তমান বরাক উপত্যকায় এসে আস্তানা গেঁড়ে ছিলেন এবং এখানকার মাটিতেই শায়িত হয়ে আছেন। পরবর্তীকালে আরো অনেক পীর-ফকির বর্হিবরাক থেকে এসে এখানকার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বরাকের মাটি থেকেও বেশ কয়েকজন পীর-ফকিরের আবির্ভাব হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে বরাকে জনজীবনে প্রভাব ফেলেছেন।

বরাক উপত্যকার পীর-ফকিরগণের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শাহ সুফি মোবাসসির আলি (কাটিগড়া), লঙ্গর শাহ বাবা (ফুলেরতল), বাবা মখা শাহ (শিলচর), পীর হাতিম আলি সাহেব (বদরপুর), মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী (বদরপুর), মাওলানা আহমদ আলি সাহেব (বাঁশকান্দি), পীর আব্দুল আজিজ চৌধুরী (টাণ্টু), শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল হোক (উজানডিহি), মরমি সাধক ছয়ফুল মিয়া (বাঁশকান্দি), শাহ আদম খাকি (বদরপুর), দূরবীন শাহ, আল্লামা তৈয়ীবুর রহমান বড়ভূইয়া (হাইলাকান্দি), মৌলানা আব্দুল আজিজ (জবাইনপুরি), মৌলানা জমিলুন্নবী চৌধুরী (বাগপুর), মৌলানা আহমদ সৈয়ীদ (গোবিন্দপুর), মৌলানা মুজাম্মিল আলি বড়ভূইয়া (জামিরা), সৈয়দ জুনাইদ আহমদ মদনি (উজানডিহি), নরুন্নবি খাঁন (ভাগাডহর), সারিমুল হক লস্কর (হাইলাকান্দি) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে থেকে পাঁচ/ছয় জন পীর-ফকির তথা মরমিয়া সাধকের জীবন ও কর্ম নিয়ে বর্তমান আলোচনা। আলোচ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন যেমন অনেকেরই কাছে আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিল তেমনি এঁদের কর্ম বিশেষ করে সৃষ্টিমূলক কর্ম সাহিত্য ক্ষেত্রকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। এঁদের রচিত গান সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া তাঁদেরকে নিয়ে রচিত জীবনীমূলক গ্রন্থ জীবনী সাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কিংবদন্তি গুলোও মৌখিক তথা লোক সাহিত্যরূপে জনমানসে বিরাজ করছে। এসব কথা মনে রেখে আমি আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করছি। এতে বরাক উপত্যকার পীর-ফকিরদের মধ্য থেকে ফকির শীতালংশাহ, মরমি সাধক ছয়ফুল মিয়া, সৈয়দ শাহ নূর, দূরবীন শাহ, পীর আব্দুল আজিজ চৌধুরী, সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি আব্দুল নূর বড়লস্কর ও মৌলানা আহমদ আলি। প্রমুখের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করছি।

ফকির শিতালং শাহ : শিতালং শাহ এর আসল নাম ছিল মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ। তিনি ফকিরি নাম গ্রহণ করেন শিতালং। নিজের জন্ম সম্বন্ধে একটি গানে আছে—

'শিতালং নাম মোর গুনাহ বেশুমার
কৃপা যদি কর আল্লা করিম গফ্ফার।
মোহাম্মদ সলিম উরফে দোষগুণে মাজুর।
পরগনে চাপঘাট মোর পয়দিশ সেথায়
শ্রীগৌরী মৌজায়েতে, শিলচর কিত্তায়।।'[১]

শিতালং শাহ জন্ম হয় ১২০৭ বঙ্গাব্দে সিলেট পূর্বতন জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার শ্রীগৌরী মৌজায় এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর পিতার নাম মুন্সী জাহা বখশ মুনশী। শিতালং শাহের জন্মের পর পিতা শ্রীগৌরীর বাসস্থান ত্যাগ করে কাছাড় জেলার তারিণীপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এই গ্রামে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত

করেন। তিনি পরে সিলেটের ফুলবাড়ি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে পাঠ শেষ করে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কথিত আছে শিতালং শাহ ভুবন পাহাড়ে ১২ বৎসর তপস্যা করেন। তাঁর পর সংসার জীবনে প্রবেশ করেন এবং দেওরাইল মৌজায় শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর তিন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ভাঙ্গা বাজার রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী বার ঠাকুরী গ্রামে তাঁর মাজার বর্তমান। তিনি তাঁর কবর পাকা করতে নিষেধ করেছিলেন। আজও অনেক ভক্তপ্রাণ তাঁর মাজার জিয়ারত দর্শন করতে আসেন। শিতালং শাহের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের খবর পেয়ে প্রচুর লোক তাঁর মুরিদ হতে লাগলেন। শিতালং শাহের মতে আল্লাকে পেতে হলে রসুলকে ধরতে হবে। আর রসুলকে পাওয়ার একমাত্র রাস্তা শরিয়তের সব হুকুম মেনে চলা। তিনি নিজে ছিলেন শরিয়তের পাবন্দ। তাঁর গানের মাধ্যমে তিনি বিশ্বমুসলিমকে শরিয়ত মেনে চলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে শরিয়ত ছাড়া মারিফত লাভ করা যায় না। একটি গানে তিনি বলেছেন—

"ধুরিলে বন্ধুরে পাইবায় বন্ধু আছইন ছিরিপুর
আগে চিন মোহাম্মদী নূর।"[২]

এখানে বন্ধু বলতে হজরত মোহাম্মদকে নির্দেশ করা হয়েছে।

শিতালং শাহ অসংখ্য গান রচনা করেছেন। শিতালং শাহের গানে তাঁর হৃদয়ের আকুলতা খুবই সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গানে ইসলামি ভাবধারার একটি প্রবল প্রীতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে অনেক গান রচনা করেছেন। হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত সাধনার এটা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শিতালং ভাবের মানুষ। মানুষের প্রেমকে ঈশ্বরের প্রেমে রূপায়িত করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। নিজের জীবনের সবকিছু ঈশ্বরকে সপে দেওয়ার মধ্যে তিনি আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। শিতালং শাহ ভাবতেন আমিত্ব বলতেই কিছুই নেই। ক্ষণস্থায়ী জীবনে অস্থায়ী বস্তুর মধ্যে আনন্দ না খুঁজে তিনি চিরস্থায়ী আনন্দ পেতে চান। ঈশ্বরের অপার রহস্য খুঁজতে গিয়ে তিনি রচনা করেছেন অজস্র গান আর সুর। নাইটেংগলের গান কীটসকে একস্বপ্নময় রাজ্য নিয়ে গিয়েছিল। স্কাইলার্কের গান শেলীকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গিয়েছিল সীমাহীন উদার নীলছায়ায়। আমরা দেখতে পাই সাধক শিতালং শার সুয়াপংখী খাঁচা ছেড়ে মিশে যেতে চাইছিল মহাসৃষ্টির মহান স্রষ্টার সাথে।

"শুয়া উড়িলরে জীবের জীবন
শুয়া উড়িল রে।
লা মোকামে ছিলায় শুয়া
আনন্দিত মন,
পিঞ্জিরায় থাকিয়া কৈলে প্রেমের সাধন
ছাড়িয়া যাইতে কিছু না লাগে বেদন।।
শুয়া উড়িলরে...।"[৩]

পরমেশ্বরের প্রেমে আত্মবিভোর সাধক পার্থিব ভোগ লালসার উর্ধে। দেহজ, প্রেম নয়। তাই কলংকের ভার তার নেই—

'পিরিতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার অলঙ্কার
কুলমানের ভয় নাইরে তার।।
যার গলে পিরিতের ফাঁসি সে হয় সকলের দাসী গো।
লোকের নিন্দন পুষ্পচন্দন অলঙ্কার পাইরাছে গায়।[৪]

লোভ মোহই মানুষকে অন্ধকারে রাখে। যখন তার মন সচেতন হয় তখন কিন্তু সময় শেষ হয়ে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যেয়। সন্ধ্যে থেকে রাত্রে। তখন মন কথা কয় নিজে থেকে নিজে।

'মনরে বেলা গেল সান্ধা হৈল
ভুলিয়া রৈলাম কারে দিখে।
সঙ্গের সঁঙ্গীলা সবে
দিয়া যায়রে ফাঁকি।
হুশ গেল বুদ্ধি গেল চক্ষের গেল জ্যোতি
কারে লৈয়া করবায় মন এই ভবের বসতি।[৫]

শিতালং শাহ প্রেমিক ভাবুক প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য অজানাকে জানার জন্য তাঁর করুণ আর্তি। ঈশ্বরের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে মারিফতের ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গানের মধ্যে। মানুষের অজুদ অর্থাৎ শরীরের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে তিনি একটি গানে বলেছেন—

'বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্, গলি আদমের অজুদে।
কৌশল করিয়া পয়দা করিছে মাবুদে।।
আদম অজুদে শির আছমান সমান।
কলবে আল্লার আরশ দম সদায় যুগান।।
কলবের মাঝে আছে সোনার সিংহাসন
আজিমুসানের সদা এথায় আগমন।।
দমে আইসে দমে যায় অপূর্ব কথন
সব কথার ভেদ পায় সে যার মুর্শিদ সুজন।।[৬]

সুফি সাধক কবি শিতালং শাহের কেরামাত সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী ও কেচ্ছা কাহিনি আজ ও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়।

ছয়ফুল মিয়া: বরাক উপত্যকার কাআছাড় জেলার তৎকালীন শিলচর মহকুমার (বর্তমান লক্ষ্মীপুর মহকুমায়) বাঁশকান্দির অদূরে গোবিন্দপুর গ্রামে আনুমানিক ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ছয়ফুল মিয়ার জন্ম। পিতার নাম ফয়জুল বারি, মাতার নাম আলকাছ বিবি। ক্ষৌরকার পিতার পুত্র ছয়ফুল মিয়া মাইজ ভাণ্ডারীর আদর্শে মরমী সংগীত গাইতে শুরু করেছিলেন বালক বয়স থেকে। তিনি বরাক উপত্যকার পল্লীজীবনে এনেছিলেন কবিগান আর মরমী গানের এক স্বতন্ত্র ধারা। এই ধারা তাঁর রচিত অসংখ্য গানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁর গানগুলি মোট নয়টি খণ্ডে বিধৃত হয়ে আছে।

বরাক উপত্যকার জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা বরাকেরই ভূমিপুত্র ছয়ফুল মিয়ার গানগুলোকে যেন গ্রীষ্মের দিনে শীতল বাতাস। মৃত্তিকা সম্ভব জনজীবনের এই মরমী গীতিকার মাটির মানুষের মনকে সুর ও বাণীর মালায় গেঁথে আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাই যখন বলেন—

'অন্তরে জ্বালাইয়া অগ্নিরে বন্ধু দেখ চাইয়া চাইয়া।
মুখ দেখিয়া দুঃখ বুঝ না তুমি আমার হইয়া।।[৭]

তখন মানব মনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার পিছনে যে গভীর আত্মপ্রকাশ চিরন্তন কামনা তা-ই ধ্বনিত হয়।

ছয়ফুল গাইতেন গভীর তত্ত্বকথার মর্মস্পর্শী গান যা সাধারণ মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। একটি গানে মরমী গীতিকার ছয়ফুল মিয়া বলেছেন—

'পাহাড়ের কাঁদিতাম যদি বন্ধু পাহাড় হইত পানি।
জগতে রইত নাম লোকের জানাজানি।।[৮]

ছয়ফুল তাঁর অধিকাংশ গানে 'আল্লাহ'কে স্মরণ করেছেন। কোথাও তাঁর মুর্শিদকে স্মরণ করে তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কোথাও মা ফাতেমা আবার কোথাও বা খোদাকে 'ছাজিদা' করেছেন। আবু বক্কর, উসমান গনি-এঁদের কথাও তিনি স্মরণ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

'ফাতিমা জহুরা বিবি পিতা যার নূরনবি।
দুজাহানের ইমাম দুই প্রেমের ছবি।।[৯]

ছয়ফুলের ইহজাগতিক কামনা-বাসনা তেমন নেই। শুধু একটি প্রার্থনা—

'শেষ বিচারে দেখা দিও তুমি।
আমার হইয়া বন্ধুরে প্রেমের মহাজন।।[১০]

আল্লা-নবি, মাশুক-আসেক, মুরিদ-মুরশিদ বিষয়ক মরমী গীত রচনার পাশাপাশি ছয়ফুল যখন লেখেন—

'আমার প্রেমময়ী রাই আমার বিনোদিনী রাই।
তোমার প্রেমে মন দিয়া আমার শান্তি নাই।।[১১]

তখন মনে হয় বৈষ্ণব পদের চিরন্তন রসমাধুর্যেও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অসংখ্য গীত বিরহ জীবনের কষ্ট কথায় করুণ - যা জাত-পাত, ধর্ম-সম্প্রদায় ভাবনার ঊর্ধ্বে।

ছয়ফুল মিয়ার মরমী দর্শন আসনে আত্ম-উপলব্ধির এক আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী দর্শন। তিনি বিশ্বাস করেন ধর্ম সাধনার মূল উদ্দেশ্য মনের মানুষকে পাওয়া। ধর্মের প্রচলিত অধিকাংশ বিধিনিষেধ ও বেড়াজালে তিনি কখনো নিজের সহজ সাধনার গতিকে রুদ্ধ করেন নি। তাঁর বিশ্বাস প্রেমাস্পদের অবস্থান মানুষ্য হৃদয়ের। তাই তাঁর মিলন কামনা একই সাথে স্রষ্টা ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সাথে মিলন কামনা। তাঁর গভীর বিশ্বাস প্রকৃত প্রেম বিনা ঈশ্বর প্রেম সম্ভব নয় কখনোই।

ছয়ফুল মিয়ার মরমীগানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল গুরু বা মুর্শিদের কাছে অকপট আত্মসমর্পন, আল্লাহর কাছে সাধন-ভজনের অক্ষমতার জন্যে নৈরাশ্য। তাই আল্লাহ তথা দিন-দরদি স্রষ্টার কাছে ছয়ফুল দৈন্য বা আর্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁর দয়া, করুণা ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন—

'হাজার দুরুদ ভেজ নবিজীর চরণ।
আবু বক্কর উসমান গনি সঙ্গে চারিজন।।
সবার কাছে আছি নত আমি মূর্খজন।
ভুল ত্রুটি মাফি চাই এই নিবেদন।।[১২]

সৈয়দ শাহ্ নূর : সৈয়দ শাহ নূর ছিল্লেন বরাক উপত্যকার একজন শক্তিধর ঐশী সাধক। তিনি ছিলেন একজন সার্থক মারেফতি গীতিকার তথা সুরকার।

বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার চাপঘাট পরগণায় সৈয়দ শাহ নূর আজও পীর নূর আলি নামে পরিচিত হয়ে আছেন। তাঁর জন্ম সন তারিখ ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন তাও আমাদের অজানা। তবে তিনি ছিলেন এক বাধানহারা পথিক । নিজ গতিতে চলতে চলতে এক সময় তিনি বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার চাপঘাট পরগণায় এসে হাজির হয়েছিলেন। এখানে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ভক্ত মণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হন। ভক্তি পরায়ণ জনগন তাঁকে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। বর্তমান ভাঙ্গা বাজারের নিকটবর্তী যে স্থানে তাঁর বাস গৃহ নির্মিত হয়েছিল এখনও তা 'জমির কাগজ পত্রে' চাপাঘাট

পরগনা নামে উল্লেখিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই চাপাঘাট সুপারির জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত জায়গা। প্রবাদ আছে, "চাপাঘাট সুপারি। ভাঙ্গা পারের ব্যাপারী।" লস্কর বাজারের কাছে যে পতিত বাড়ির চিহ্নাবশেষ কিছু দিন আগেও চোখে পড়ত তা 'নূর আলির বাড়ি' নামে পরিচিত। নূর আলিই হলেন সৈয়দ শাহ নূর। এখানে তিনি বেশ কিছু দিন বসবাস করেছিলেন। কিন্তু এই আধ্যাত্মসাধক একান্তই ছিলেন সংসার বিরাগী। তাই তিনি একদিন শ্রীহট্ট জেলার জালালসাফে এক মুরিদানের বাড়িতে গিয়ে তিনি জান্নাতবাসী হন।

পীর সৈয়দ শাহ নূর বেশির ভাগ সময়েই আল্লাহর ধ্যান নিমগ্ন থাকতেন। ঐশী প্রেমের ভাবরাহী মরমী অধ্যাত্ম গীতিকার শাহ নূরের জীবন সম্পন্ন ভাবেই ঈশ্বর-চেতনায় ঋদ্ধ। তাঁর রচিত অসংখ্য মরমী গীতি কবিতা বা অধ্যাত্ম সংগীত বর্তমানে লোক সাহিত্যের গবেষকদের কাছে মূল্যবান সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বরাক উপত্যকা তথা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেখানে মরমিয়া সাধক ও সাধনগীতির কথা উল্লেখিত হবে সেখানেই অধ্যাত্মসাধক শাহ নূরের কথা শ্রদ্ধারর সঙ্গে উচ্চারিত হবে, কারণ তাঁর রচিত সাধন সংগীত বাংলা ভাষায় অধ্যাত্মভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সংযোজন।

শাহ নূর ছিলেন্ন মুর্শিদ শাহ মঞ্জুরের অনুরাগদীপ্ত এক যোগ্য মুরিদ। এর তত্ত্বাবধানে তিনি যুবক বয়সেই নিজেকে আল্লাহার প্রেমে উজাড় করে দিয়েছিলেন। 'ইবাদিত বন্দেগি' শুরু করে দীর্ঘ সাধনা শেষে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। অধ্যাত্মসাধনার একাধিকস্তর অতিক্রম করে তিনি আল্লাহতা'লার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এরপরে মুর্শিদের কাছে তিনি আস্তানা ত্যাগের প্রার্থনা জানান। কারণ শাহ নূরের মন কখনো এক জায়গায় বাঁধা থাকত না। মুরিশিদ শাহ মঞ্জুর আলি মুরিদের কেরামতির পরিচয় পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে স্বাধীন বিচরণের অনুমতি দান করেন। স্বভাব কবি সৈয়দ শাহ নূর সব বাধা ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়লেন। জনগন তাঁর হৃদয় উজান করা আল্লাহ প্রেমের নজির দেখে তাঁকে বাসস্থান নির্মাণ করে দিতেন। কিন্তু সর্ব বন্ধন মুক্ত এই সিদ্ধ পুরুষ কোনো বাঁধনেই বাঁধা পড়লেন না।

সৈয়দ শাহ নূরের এই ঘর ছাড়া জীবনের আভাস মেলে তাঁরই রচিত একটি গানে-

'থিত নাই বেথিতে র ইলাম
সদায় চঞ্চলমতি
ইষ্টি নাই কুটুম নাই
মুরশিদ সারথি।।"[১৩]

আরেকটি গান তিনি লিখেছেন-

'মারিফতের কথা মুই করিলু প্রচার
সবাই বিয়াত কর গুনা যে মার।।"[১৪]

শাহ নূরের গানে মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা, উপেক্ষা প্রভৃতি নেই, আছে মহামানব সম্বন্ধের কথা। প্রচলিত ইসলাম ধর্মের নীতি নিয়মের মধ্যেই তিনি পূর্ণতার সাধনা করে গেছেন আজীবন।

দূরবীন শাহ: দূরবীন শাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য আজও সংগৃহীত হয়নি । তবে তাঁর মরমিয়া গান গুলিকে যিনি প্রচারের আলোয় নিয়ে আসেন তিনি হলেন বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি নিবাসী তৈমুছ মিয়া। উনার বাসস্থান ছিল হাইলাকান্দি জেলার লালা অঞ্চলে। তার কণ্ঠে প্রচারিত দূরবীন শাহের গানে আমরা পাই মহা প্রেমের কথা। প্রকৃতি জগত থেকে নানা তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে এই পল্লীকবি তাঁর মারিফতি গান গুলিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলামীয় ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মচারকে আশ্রয় করে এক দিকে তিনি যেমন এই ধর্মের মূল কথাকে নিতান্ত সাদামাটা ভাষায় প্রকাশ করেছেন, অন্য দিকে তেমনি সুমধুর গীতি রসের ধারায়ও তাঁর বক্তব্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত সঙ্গীত বরাক উপত্যকার লোক জীবনের অমূল্য সম্পদ। শুধুবরাক উপত্যকায় নয়, দক্ষিণ আসামের গ্রামে গঞ্জে দূরবীন শহ

একটি সুপরিচিত নাম। এখানে তাঁর রচিত এমন একটি গানের কথা উল্লেখ করছি যেখানে তিনি পাখির প্রতীকে মাবন জীবনচর্যার এক বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় তুলে ধরেছেন-

'কোকিল পাখি ডালে থাকে গাইতেছে বসন্তের গান।
বিঙ্গরাজ হয় পীরিত কর পাইবেরে দুনিয়ার মান ।।'[১৫]

এখানে 'বিঙ্গরাজ' পাখি আর কেউ নয়, স্বয়ং দূরবীন শাহ। 'পীরিত' তাঁর কাছে। এই প্রেমের দ্বারাই পরম প্রিয়তমকে জানা যায়।। সাধক গীতিকার দূরবীন শাহ তাঁর অসংখ্য পদে পার্থিব জগত থেকে উপমা-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। একটি গানে তিনি বলেছেন-

"মুনিয়া পাখি বনে বসি গাইতে আছে রসের গান।"[১৬] এই 'রসের গান' আর কিছুই নয়, আল্লার প্রেমে আশেক হওয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের অন্তর্জগতের মাটি ভালভাবে কর্ষিত না হলে আত্মজগতে কোনো ফুলই ফোটে না। তিনি বলেন, "ফুল খাউরিয়ে সময় হারায় পাইয়া ফুলের ঘ্রান" অর্থাৎ আপাত সুন্দর এই মানব জীবন অবহেলায় বিনষ্ট হয় শুধু 'ফুলের ঘ্রানে'। এই 'ঘ্রান' নিতান্তই সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং ভবনদীতে প্রেম প্রীতির নাও' ভাসাতে হবে। দূরবীন শাহ ছিলেন দিব্যজ্ঞান সন্ধানী মরমিয়া কবি। তিনি জানেন, দেহের খনিতেই লুকিয়ে আছে অমূল্য রত্ন 'আত্মা'। তাই দেহকে না জানালে নিজেকে জানা যায় না। আর নিজেকে না জানলে মহান-অনন্ত-চিরজাগ্রত-অন্তর্যামী আল্লাহকে জানা যায় না। এই মহাসত্যকে তিনি একটি রূপকাশ্রিত পদের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এই ভাবে-

'রাজ্যের আশে সর্ব দেশহে পাখি সাজে সব জানায়
সাধন ভজন শিখতে শিখতে রাজ্য নিল পেচকুনায়'।[১৭]

এখানে 'পেচকুনা' বা প্যাঁচা আর কেহ নয়, স্বয়ং মৃত্যু। 'রাজ্য নিল পেচকুনায়' অর্থাৎ জীবন ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। সংসারে চাওয়া-পাওয়ার শেষ নেই। কিন্তু তাকে তো রোধ করতেই হবে। না- করলে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব নয়। নানা প্রবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দরকার প্রকৃত শিক্ষা যা সাধন-ভজনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই সাধন ভজনের দ্বারাই দ্রুততার সঙ্গে ষড়রিপুর দমন করতে হয়। কাজটি এত কঠিন যে মৃত্যুকাল অবধি সাধনায়ও কনেকে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না। এই ধরণের গানের কলিতে দূরবীন শাহ যা বলতে চেয়েছেন তা হল অবিরাম আপন রিপুর সনহে লড়াই করতে হবে। কিন্তু যোদ্ধার জয়তো আর সব সময় হয় না। জীবন উদ্যাঙ্কে যদি ভাল ভাবে সিঞ্চিত করা যায় তবেই সেখানে জীবন রঙ্গিন ফুল ফুটবে।

মরমী গীতিকার দূরবীন শাহ প্রকৃত অর্থেই ছিলেণ সুকবি। পদবিন্যাসের গুণে তাঁর অসংখ্য গান প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর রচিত একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে-

ফটই পাখি রাজা হইবে মুরতা বনে লইছে ফাল।
গান শুনিয়া কুড়া পাখি ডাইনা বাউয়া লইছে টাল।[১৮]

সাধক কবি শাহ তার সংগীত পদ-বিন্যাসের মাধ্যমে মানবপ্রেম তথা ঈশ্বর প্রেমের জন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

টান্টুর পীর সাহেব: টান্টুর পীর সাহেবের পিতৃদত্ত নাম আব্দুল আজিজ চৌধুরী। উনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে পবিত্র ভূমি টান্টুতে বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের হজরত হাছন মিয়ার ঔরসে এবং পুন্যবতী মাতা হজরত মিছিরার গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হাছনমিয়া চৌধুরীর কাছে মক্তব অধ্যয়ন কালেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষার আগ্রহ, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যা একবার শুনতেন তা আর ভুলতেন না। নয় বছর বয়সে তিনি নয়াগ্রাম আহমদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং উর্দ, ফার্সি ও আরবি ভাষার ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপান্তে তিনি হাইলাকান্দির মাটিজুরি মাদ্রাসায় ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণে ভর্তি হন। সেখানে তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষক মণ্ডলির প্রীতিভাজন হয়ে ওঠেন। আনুমানিক ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হজরত তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা টাইটেল মাদ্রাসায় গমন করেন। কলকাতা মাদ্রাসায় তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু সাহিত্য এবং একই সঙ্গে কোরান, হাদিছ, ফেকাহ শাস্ত্র, হেকিমি ও তিব্বিয়া শাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। আনুমানিক ১৯৩০ খ্রিস্টব্দে নাগাদ তিনি কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন এবং নয়াগ্রামে আহমদিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন । ৩৪ বছর বয়সে জুলুবান বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । প্রথমা স্ত্রী পরলোক গমন করলে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন । দ্বিতীয় স্ত্রী কুটিফুক বিবিই প্রকৃতপক্ষে পীর সাহেবের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে ছিলেন।

টান্টুর পীর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে (৩০ মার্চ) শুক্রবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে তাঁর ইহজীবন সমাপ্তি ঘটে।

পীর আব্দুল আজিজ সাহেবের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন তথা কেরামতি বিষয়ে অনেক কাহিনি বরাকের জনমানসে প্রচলিত আছে। এই কাহিনি গুলো লোককথার আকারে লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া তাঁকে নিয়েও লিখিত সাহিত্য তৈরি হচ্ছে। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত রচিত হয়ে জীবনী সাহিত্যের ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে। তাঁকে উপলক্ষ করে রচিত সাহিত্যের একটি উদাহরণ হল মোঃ হবিবুর রহমান মজুমদার প্রণীত "টান্টুর পীর হজরত আব্দুল আজিজ(রঃ)" শীর্ষক গ্রন্থটি।

তার অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে নিম্নে দু-তিনটি উল্লেখ করা হল- একদিন কনকপুরের নকশবন্দী পীর সাহেব টান্টুতে আগমণ করেন। তিনি টান্টুতে পশ্চিমে একটি ছোট টিলার উপর নকশবন্দী তরিকার খতম পাঠ আরম্ভ করেন।। কনকপুরের পীর সাহেব যখন টান্টুর এই টিলার উপর তরিকতের হাল্কার কাজ শুরু করেন। তখন টান্টুর পীর সাহেবের নির্দেশে এই টিলার উপর মাটি কেটে তাঁর ভক্তেরা একটি সুন্দর সমতল হাল্কার স্থান তৈরি করেন এবং পীর সাহেব এই টিলাকে 'মোকাম টিলা' নামে আখ্যায়িত করেন। একদিন আছরের নমাজের পর পীর সাহেব তাঁর এক অনুগত শিষ্যকে নিজ কনুই কাছে বসে তাঁর বাহুর নীচ দিকে মোকাম টিলার একদিক হতে অন্যদিক দেখতে বলেন ।পীরের কথা শুনে লোকটি যখন দেখতে লাগল, তখন দেখলেন সারিসারি পাঁকা ঘর বাড়ি অনেক লোকের সমাবেশ। কিন্তু কনুই কাছ থেকে সরে যাওয়ার পর আর কিছুই দেখলেন না। এরপর পীর সাহেব প্রায়ই বলতেন এখানে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মানব কল্যাণাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য সম্প্রতি পীর সাহেবের অবস্থান কালেও মোকাম টিলায় একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা, একটি ঈদগাহ ও একটি এম.ই স্কুল গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের একটি বিরাট কার্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

আরেকটি অলৌকিক ঘটনা হল- টান্টুর এক ব্যক্তি পীর সাহেবের খুবই অনুরক্ত ছিল। এই অনুরক্ত ভক্তের পিতার উপর এক মারাত্মক মোকদ্দমা হয়েছিল। মোকদ্দমাটি এত জঘন্য ছিল যে, লোকটির পিতার জেল ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না। লোকটি পীর সাহেব কে খুব বেশি জড়িয়ে ধরে আকূতি করে বলল পীর সাহেব আপনি দোয়া করে দেন, যাতে আমার পিতা এই মোকদ্দমা থেকে রেহাই পান। পীর সাহেব হঠাৎ মনে মনে কি বললেন, এরপর প্রকাশ্যে বলে উঠেন, "যাও, হাকিম তোমার বাবাকে শাস্তি দিতে পারবে না। তোমার পিতার নাম শাস্তির হুকুম লিখতে পারবে না। যদি লিখতে চেষ্টা করে, তবে এই নামে কালি লাগিবে না।" মোকদ্দমা তারিখ যখন এসেছিল, গ্রামের অসংখ্য মানুষ এই বিচারের রায় শুনার জন্য হাইলাকান্দি আদালতে ভিড় জমান। মোকদ্দমা রায় হল, আসামিদের কয়েক বছর জেল হল। কিন্তু উপরের উল্লেখিত ব্যাক্তির পিতা বেকসুর খালাস পেলেন। পীর সাহেবের দোয়ায় এই ব্যক্তি রক্ষা পায় সেই দিন।[১৯]

সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি: শাহসুফি সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি আল হুসাইনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে অখণ্ড ভারতের শ্রীহট্ট তথা বর্তমান করিমগঞ্জ জেলায় ধনিবর (উজানডিহি) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ মহনি আল হুসাইনি। সৈয়দ আব্দুল হোক মহনির মাতার নাম জানা যায়নি।

সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি ছোট বয়সে উজান ডিহি মক্তবে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। কিশোর বয়সে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীহট্টের ফুলবাড়ি মাদ্রাসায়। স্থির-ধীর,শান্ত-সৌম্য, মেধাবী কিশোর সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি সুনামের সাথে ফুলবাড়ি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাপ্ত রয়সে তিনি করিমগঞ্জ সাহাবাজ এলাকার এক গুণী-মানী পরিবারের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রথমে তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম, কালক্রমে ইব্রাহিমের পীর তাঁর নাম বদলে সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি করে দেন।

সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি যথার্থ অর্থেই ছিলেন অলিয়ে কামিল, মুরিদানেরা তাঁকে দাওয়াত করলে তিনি খুব সহজে তা কবুল করতেন। সমগ্র জীবনব্যাপীই তিনি ইসলাম তথা তরিকতের খিদমত করে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে শনিবার রাত ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দুদিন পর (১৫ মে ১৯৬৭ সোমবার) জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজার হাজার তরিকত পন্থী মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন।

সৈয়দ আব্দুল হোক মদনি ছিল এন এক ভাবগম্ভীর পুরুষ। মুরিদানেরা তাঁর সুন্দর আর পবিত্র চরিত্রে মুগ্ধ হতেন। সহাস্য মুখে তিনি জনসমক্ষে অছিয়ত-নছিয়ত করতেন। পিতার রওজা মো্বারক জিয়ারৎ করে তিনি কখনো ঘোড়ায় চড়ে, কখনো নৌকাযোগে নয়তো বা হাতির পিঠে চড়ে এবং অনেক সময় পালকিতে চড়ে মুরিদানে যাতায়াত করতেন। তাঁর ব্যবহৃত পালকি এখনও পুরনো সাহেব বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর ব্যবহৃত লোহার পালঙ্কটিও এখনও বিদ্যমান।

বহু অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ তাঁর জীবন। একদিন তিনি শিষ্যদের নিয়ে বাড়িতে গল্প করেছেন। খাবার সময় প্রায় হয়ে গিয়েছে অথচ খাবার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না ঘরে। তিনি তাদের সবাইকে খেয়ে যেতেও অনুরোধ করেছেন। এমন সময় একজন লোক প্রচুর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বাড়িতে আসেন, যা তিনি সবাইকে খেতে দেন। একদিন তাঁর বড় মাছ খওয়ার ইচ্ছা হয়েছে অথচ তখন মাছ ঠোঁটে করে নিয়ে এসে বাড়ির প্রাঙ্গণে ফেলে দিয়ে চলে যায়। সেই মাছ তিনি পরিবার সমেত খেলেন।

সুতারকান্দির এক রোগী বদরপুর নিবাসী শাহ হাতিম আলি সাহেবের কাছে রোগ মুক্তির জন্য গেলে তিনি রোগীকে শিলচরস্থ বাখরশাহ বাবার ওখানে যেতে বলেন। রোগী ট্রেনে চড়ে, পায়ে হেঁটে মধুরবন্দ এলে বাখর শাহ বলেন, তিনি ওষুধ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ওষুধ গ্রহণ করে রোগী তাঁকে কিছু দান করতে চাইলে বাখর শাহ বলেন, টাকাটা করিমগঞ্জের ঘোড়াওয়ালাকে দান কর। অন্যদিকে ঘোড়াওয়ালা মানে সৈয়দ আব্দুল হোক সাহেব বাংলাদেশ চরিয়ার যেতে ঘোড়া নিয়ে পরদিন অপেক্ষা করেছেন। হঠাৎ দেখেন রোগীটি সেখানে আসছে, তিনি বলেন, তাড়াতাড়ি এস, তোমার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনজন আলির বিশেষ কেরামত এই ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পায়।

আব্দুল নূর বড়লস্কর: আব্দুল নূর একদিকে ফকির যিনি ইসলামীর ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারকে আশ্রয় করে নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, অন্যদিকে তিনি একজন কবি ও গীতিকার। কাছাড় জেলার ভাগাবাজার বনগ্রামের বাসিন্দা এই ফকির 'ওয়াজেদ" বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে শুধু বিশ্বাসী নন, অনুসারীও। ভারতেন নানা স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এবং গীতের মধ্যে দিয়ে তিনি ইসলামের মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। শুধু মারিফতি গান নয়, তিনি রচনা করেছেন খাজা আশিকের গান, জিকির, মুর্শিদি ও ইসলামি গজল। তাঁর একটি ভক্তিমূলক গান হল-

"কলিমা সাধন কর আমার হায়রে ভোলো পাগল মন।

যেই কলিমা মরলে পরে করবে রে কবর রৌশন.।।[২০]

তাঁর রচিত ফকিরি গানে ইসলাম ধর্মের তত্ত্বগত ও বিশ্বাসগত দিকটি ফুটে উঠেছে, তিনি যে একজন প্রকৃত সুফি সাধক তা প্রমাণিত হয় তাঁর রচিত এই ধরনের গানগুলিতে। যেমন-

"আনতালবাদি আওনাত হোক লাইছে মৌলা ইল্লাহ।
দ্বীন মোকামে পড় ও মুমিন লাইলাহা ইল্লাল্লা।।"[২১]

তিনি অসংখ্য জিকির অর্থাৎ স্মরণজপ জাতীয় গীত রচনা করে ইসলামি আধ্যাত্ম জগতে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত একটি গীতে তিনি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

"ও সোনা বন্ধুরে আমি চিনিলাম না তরে।
আপন ঘরে থাইক্যা তুমি খেলছ বারে বারে।।
নিজ ছুরতে বানাই তন সাজাইছ সাঁই নিরঞ্জন।
'কলব' কোঠায় রইল আলব কে বুঝিতে পারে।।"[২২]

এ তো এক ধরনের অনুভব। অনুভূতি দ্বারা সমর্থিত হয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পন ও ভক্তিযোগের আমল করেই তিনি হয়েছিলেন ঈমান্দার মুসলিম। এখানে "সোনা বন্ধু" আর কেউ নন, স্বয়ং স্রষ্টা- যিনি সৃষ্টির নিরন্তর খেলায় মগ্ন, আব্দুল নূর আরো লিখেছেন-

"আট কটুরায় বানাই ঘর ষোল জন কাণ্ডারী তার।
মাঝিয়ে চালায় তরী ছাব্বিশ হাজার ছয়শ বার।,
বাহাত্তর হাজার তারের বেড়া ছয় খুটিতে করলে কাড়া।
আঠারো কোঠা রইল ভাড়া আট বাকেতে বিরাজ করে।।
সদায় ঘরে যাওয়া-আসা পুরলো নারে মনের আশা।
আব্দুল নূর কয় মুরশিদ ভজও পথের মানুষ মিলতে পারে"[২৩]

এই 'পথের মানুষ' তথা জীবন পথে সঠিকভাবে চলার একমাত্র সঙ্গী হলেন পরমশক্তিমান ঈশ্বর।

নিজের জীবনকে বা মনকে ময়না পাখির সাথে তুলনা করে আব্দুল নূর রচনা করেছেন-

"ও ময়না পাখিরে আর কতকাল তোমায় রাখি।
আমার ঘরে থাইক্যা পাখি কেমনে ছিলায় লুই।।
আর দুধ কলা খাওয়াই তরে থাকো পাখি।
যাবার বেলায় কওনা কারে দিয়া যাও ফাকি।।
নাগাইয়া প্রেমের ডোরি আমি কেমনে বইয়া থাকি।
আব্দুল নূর কয় ময়না পাখি খাচায় বন্দি তুমায় রাখি।।"[২৪]

এই গানগুলো আমাদের হৃদয়কে শুধু নাড়া দেয় না, সম্প্রসারিত করে। পরম শক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোভাসার কথা তিনি শুনিয়েছেন তাঁর মরমী গীতি কবিতায় । তাঁর অধিকাংশ গানে ধ্বনিত হয়েছে ঈশ্বর প্রেমের মহান কথা-

"আব্দুল নূর কয়রে পাখি নবিজিরে কইও ডাকি।
আর কতদিন বাকি আশা পুরায় পাক মৈলায়।।
কেমনে আমি যাব সেথায় দুরুদ পড়ি নিরালায়।"[২৫]

আব্দুল নূর ছিলেন দিব্যজ্ঞান সন্ধানী মরমিয়া কবি। প্রেম-প্রীতির 'নাও' ভাসিয়েছেন তিনি সংসার সাগরে। তাঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানে যে কথাটি লুকিয়ে আছে তা হল আত্মাই পরম রত্ন'। আবার দেহকে না জেনে আত্মানুসন্ধান বৃথা, আর নিজেকে না জানলে মহান অনন্ত-চিরজাগ্রত-অন্তর্যামী' আল্লাহতা'লাকে জানা যায় না। তাই সৃষ্টি রহস্যকে জানার প্রথম সোপানই হল দেহ।

মাওলানা আহমদ আলি সাহেব: মাওলানা আহমদ আলি সাহেবের জন্ম ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের এক শুভক্ষণে অবিভক্ত শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান করিমগঞ্জ জেলা) বদরপুরের অন্তর্গত আলাকুলিপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নাছির আলি এবং মাতার নাম ছিল ফরিদা বিবি। তাঁর পিতা ছিলেন শাহজালাল এম্নি(রঃ)এর সঙ্গী শাহ সিকন্দর গাজির খাদিম মনোহর এমনির বংশদূত। তাঁর পিতা-মাতা অসীম আধ্যাত্মিক সাধনার অধিকারী। কথিত আছে আহমদ আলী এর জন্মের পুর্বে তাঁর মাতা ১২ বছর রোজা ব্রত পালন করেছিলেন। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে বদরপুর দেওরাইল এম,ই মাদ্রাসা ও দেওরাইল সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। ওই সময় তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের খ্যাতনামা পীর সুফি আবু ইউসুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব ওরফে পীর হাতিন আলি সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। আহমেদ আলি সাহেব ১৯৩৮ সালে শ্রীহট্ট আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪০ সালে টাইটেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আরও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তে যান এবং সেখান থেকে হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং প্রসিদ্ধ ইসলামি পণ্ডিত শ্বেয়খুল হাদিস হুসাইন আহমদ মদনির কাভছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মাওলানা আহমদ আলি সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্যে নির্যাতিত ও নিপীড়িত, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্তকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। স্কুল কলেজের শিক্ষার প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ না থাকলেও ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল।

হুসাইন আহমদ মদনির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি আরো গভীর আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও সাধনা লাভের আশায় মক্কা ও মদিনায় গমন করেন। সেখানে তিনি হজরত মহম্মদের সান্নিধ্য লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন এবং সিদ্ধি লাভ করে নিজ দেশে ফিরে আসেন এক বছর পর। আসার পর তিনি গভীর জঙ্গলে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করতে চাহেন কিন্তু মদনি সাহেব তাঁকে অনুমতি দেননি। তিনি তাঁকে আর্তের সেবা ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করতে পরামর্শ দেন। মুর্শিদের পরামর্শ মেনে তিনি কাছাড় জেলার বাঁশকান্দি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাদান কর্ম শুরু করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আসামের যে সকল মুসলমান বীর সন্তান আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা আহমেদ আলি সাহেব অন্যতম। যিনি ছিলেন দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধী। জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম ছিল চিরদিন। হিন্দু –মুসলমান ঐক্যের প্রতিভূ মানবতাবাদী মাওলানা আহমেদ আলি রাজ্য জমিয়তের প্রধান ছিলেন আমৃত্যু দায়িত্বভার সামলে ছিলেন।

আহমেদ আলি জাতিদাঙ্গায় অত্যাচারিত সর্বহারা ৬০০ জন অনাথ ছেলেকে বাঁশকান্দি মাদ্রাসায় এনে তাঁদের জীবন রক্ষা করেন এবং শিক্ষা দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শান্তি,সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। তাঁর মতে ত্যাগ ও বৈরাগ্য না থাকলে মহৎ হওয়া যায় না। মানুষের হাতেই শান্তি। মানুষ ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় শান্তি আনতে পারে। প্রতিটি মহৎ কাজের উদ্দেশ্য শান্তি । প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য শান্তি। কিন্তু শান্তির জন্য থাকতে হবে ত্যাগ ও বৈরাগ্য। অহংবোধ থাকলে শান্তি আসতে পারেনা। তিনি বলতেন যে হিংসা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয় এবং সদ্ভাব সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। প্রকৃত দেশপ্রেমে ও মানবপ্রেমের অভাব এর জন্য আজ প্রতিটি সমাজ অন্ধকার ডুবেছে। তিনি নেতাজির মধ্যে দেখেছেন প্রকৃত দেশপ্রেমের বীজ।

শান্তির দূত আধ্যাত্মিক পীর অলিকুল শিরোমণী আহমদ আলি সাহেব ছিলেন শান্তি আনন্দ আর ভালোবাসার একটি জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর বাণী ছিল রিপুসমূহ তড়িয়ে দিয়ে মন প্রাণ পবিত্র রাখতে হবে। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লিপ্সা, মিথ্যা, কৃপণতা ও গৌরব সব কিছু, ত্যাগ করতে হবে। তিনি বাংলা, অসমিয়া ও উর্দুতে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গুলি তাঁর অসাধারণ মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও ধর্মপ্রেমের উজ্বল স্বাক্ষর বহন করে। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ তাঁর কাছে যেতেন, সুখে দুঃখে তিনি তাদের পাশে থাকতেন। কত দুরারোগ্য তাঁর কাছ থেকে জলপড়া, তেলপড়া ব্যবহার করে ভাল হয়েছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। অনেক অলৌকিক কেরামতের অধিকারী ছিলেন আহমদ আলি সাহেব। তিনি ধর্মীয় বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো বিভিন্ন মাদ্রাসায় সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে পঠিত হচ্ছে। তাঁকে নিয়েও অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ সংগীত (গজল) ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সাধক পীর আহমদ আলি ২০০০ ইংরেজির ১১ই জুন রবিবার ১০ টা ২৫ মিনিটের সময় ৮৫ বছর বয়সে কিডনি জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে তিনি বাঁশকান্দি মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। এখনও হাজার হাজার মানুষ তাঁর কবর জিয়ারতে যান।

তথ্যসূত্র:

১। বড়ভূইয়া, আব্দুল শুক্কুর: বরাকের পীর-ফকির, আরশি প্রকাশনী, শিলচর, প্রথম প্রকাশ ২০০৮। পৃঃ ১৩৬
২। আহমদ, কামালুদ্দীন : বরাকের সংস্কৃতি চেতনায় শিতালং শাহ, বরাক উপত্যকার বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন 'স্মরণিকা'।
৩। শর্মা, নন্দয়ালাল : শিতালং গীতি সংগ্রহ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ২০০৫। পৃঃ ২১৭
৪। তদেব : পৃঃ ১৮০
৫। তদেব : পৃঃ ২১৪
৬। তদেব : পৃঃ ২০৮
৭। তদেব : পৃঃ ১৩৮
৮। মুজুমদার, আবিদরাজ : বরাকে মাইজ ভান্ডারী গান ও ছয়ফুল মিয়া, নিবন্ধ 'বরাক' পত্রিকা ২০১৫। পৃঃ ১১১
৯। তদেব : পৃঃ ১১১
১০। তদেব : পৃঃ ১১১
১১। তদেব : পৃঃ ১১০
১২। তদেব : পৃঃ ১১১
১৩। বসু, ড. শিবতপন : আজান পীর ও অসমে ইসলাম প্রভাবিত সূফি তরিকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬। পৃঃ ১০৩
১৪। তদেব : পৃঃ ১০২
১৫। মুদরিছ আলী বড়ভূইয়া এর কাছ থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।
১৬। তদেব
১৭। তদেব
১৮। তদেব
১৯। মিজুমদার হবিবুর রহমান : টান্টুর পীর সাহেব হজরত আব্দুল আজিজ (রহঃ) (ইন্ডিয়া পাবলিশার্স)
২০। বসু, ড. শিবতপন : আজান পীর ও অসমে ইসলাম প্রভাবিত সূফি তরিকা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬। পৃঃ ৯৮
২১। তদেব : পৃঃ ১১৪
২২। তদেব : পৃঃ ১০৪
২৩। তদেব : পৃঃ ১০৪

২৪। তদেব : পৃঃ ১০৪

২৫। তদেব : পৃঃ ১০৫

সহায়ক গ্রন্থ :

১। বরাকের পীর ফকিরঃ আব্দুল শুক্কুর বড়ভূইয়া (আরশি প্রকাশনী)

২। উজানডিহি ছাব বারীর ইতিবৃত্তঃ আলহাজ্বদীন মোহাম্মদ

৩। টান্টুর পীর সাহেব হজরত আব্দুল আজিজ (রহঃ) হবিবুর রহমান মজুমদার (ইন্ডিয়া পাবলিশার্স)

৪। আজান পীর, অসমে ইসলাম প্রভাবিত সুফি তরিকাঃ ড. শিবতপন বসু।

৫। মরমী কবি শিতালং শাহঃ সম্পাদক, নন্দলাল শর্মা।

পত্র/পত্রিকা

৬। চেতনা(পত্রিকা): সম্পাদক, মজিবুর রহমান বড়ভুইয়া।

৭। পয়গাম (পত্রিকা): সম্পাদক, নুরুল হোসেন মজুমদার।